কানকাটা রাজার দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুণ্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে – যারা আমাকে এডিট করা ন্যায্য ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

ভূতপত্রীর দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্মল বুক এজেন্সী

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮১
প্রকাশক : এন. সাহা
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭
ছবি এঁকেছেন : বিমল দাস
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে
মুদ্রক : সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
প্রাপ্তিস্থান : নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পাঁচ টাকা

যে সব গল্প আছে

কানকাটা রাজার দেশ ১
কাঁচায় পাকায় ১০
কারিগর ও বাজিকর ১৫
আলোয় কালোয় ২১
বড় রাজা ছোট রাজার গল্প ২৭
টুকরি বুড়ি ৩২
ভোম্বল দাসের কৈলাস যাত্রা ৪০

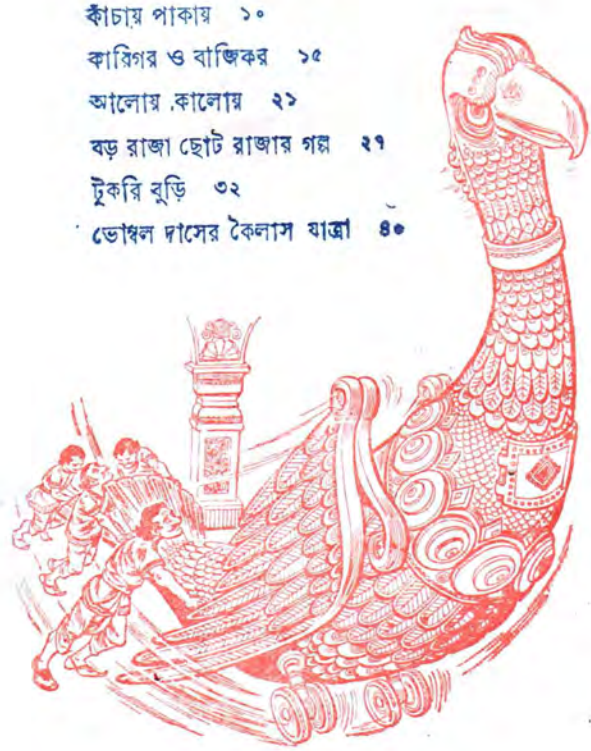

কানকাটা রাজার দেশ

এক ছিল রাজা আর তাঁর ছিল এক মস্ত বড় দেশ তার নাম হল কানকাটার দেশ। সেই দেশের সকলেরই কান কাটা। হাতি, ঘোড়া, ছাগল, গরু, মেয়ে, পুরুষ, গরিব, বড়মানুষ, সকলেরই কান কাটা। বড়লোকদের এক কান, মেয়েদের এক কানের আধখানা, আর যত জীবজন্ত, গরিব দুঃখীদের দুটি কানই কাটা থাকতো। সে দেশে এমন কেউ ছিল না যার মাথায় দুটি আস্ত কান, কেবল সেই কানকাটা দেশের রাজার মাথায় একজোড়া আস্ত কান ছিল। আর সকলেই কেউ লম্বা চুল দিয়ে, কেউ চাপ দাড়ি দিয়ে, কেউ বা বিশ গজ মলমলের পাগড়ি দিয়ে কাটা কান ঢেকে রাখতো, কিন্তু সেই রাজা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে সেই ন্যাড়া মাথায় জরির তাজ চাপিয়ে গজমোতির বীরবৌলিতে দুখানা কান সাজিয়ে সোনার রাজসিংহানে বসে থাকতেন।

একদিন সেই রাজা এক-কান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কানকাটা ঘোড়ায় চেপে শিকারে

বার হলেন। শিকার আর কিছুই নয়, কেবল জন্তু-জানোয়ারের কান কাটা। রাজ্যের বাইরে এক বন ছিল, সেই বনে কানকাটা দেশের রাজা আর এক-কান মন্ত্রী কান শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। এমনি শিকার করতে করতে বেলা যখন অনেক হল, সূর্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তখন রাজা আর মন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে, শুকনো কাঠে আগুন করে যত জীবজন্তুর শিকার-করা কান রাঁধতে লাগলেন। মন্ত্রী রাঁধতে লাগলেন আর রাজা খেতে লাগলেন, মন্ত্রীকেও দু-একটা দিতে থাকলেন। এমনি করে দুজনে খাওয়া শেষ করে সেই গাছের তলায় শুয়ে আরাম করছেন, রাজার চোখ বুজে এসেছে, মন্ত্রীর বেশ নাক ডাকছে, এমন সময় একটা বীর হনুমান সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজাকে বললে, 'রাজা, তুই বড় দুষ্টু, সকলের কান কেটে বেড়াস, আজ সকালে আমার কান কেটেছিস; তার শাস্তি ভোগ কর্।' এই বলে রাজার দুই গালে দুটো চড় মেরে একটা কান ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজা যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, তখন রাজা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হনুমানটা কোথাও নেই, মন্ত্রীবর পড়ে-পড়ে নাক ডাকাচ্চেন। রাজার এমনি রাগ হল যে তখনি মন্ত্রীর বাকি কানটা এক টানে ছিঁড়ে দেন; কিন্তু অমনি নিজের কানের কথা মনে পড়লো, রাজা দেখলেন ছেঁড়া কানটি ধূলায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে পাতায় মুড়ে পকেটে রেখে, তাজ টুপির সোনার জরির ঝালর কাটা-কানের উপর হেলিয়ে দিলেন যাতে কেউ কাটা-কান দেখতে না পায়, তারপর মন্ত্রীর পেটে গুঁতো মেরে বললেন, 'ঘোড়া আনো।' এক গুঁতোয় মন্ত্রীর নাক ডাকা হঠাৎ বন্ধ হল, আর-এক গুঁতোয় মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে রাজার সামনে ঘোড়া হাজির করলেন। রাজা কোনো কথা না বলে একটি লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদম ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। সেখানে তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে ঘোড়া দিয়েই একেবারে শয়ন-ঘরে খিল দিয়ে পালঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন!

সকাল হয়ে গেল, রাজবাড়ির সকলের ঘুম ভাঙল, রাজা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। রাজার নিয়ম ছিল রাজা ঘুমিয়ে থাকতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিতো, সেই নিয়ম-মতো সকাল বেলা নাপিত এসে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলে। এক গাল কামিয়ে যেই আর-এক গাল কামাতে যাবে এমন সময় রাজা 'দুর্গা দুর্গা' বলে জেগে উঠলেন। নজর পড়ল নাপিতের দিকে, দেখলেন নাপিত ক্ষুর হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানে হাত দিয়ে দেখলেন, কান নেই। রাজা আপসোসে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে

নাপিতের হাত ধরে বললেন, 'নাপিত ভায়া, এ কথা প্রকাশ কোরো না। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেবো।' নাপিত বললে, 'কার মাথায় দুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে!' শুনে রাজা খুশি হলেন। নাপিতের কাছে আর-আধখানা দাড়ি কামিয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন। নাপিত মোহর নিয়ে বিদায় হল বটে কিন্তু তার মন সেই কাটা কানের দিকে পড়ে রইলো। কাজে কর্মে, ঘুমিয়ে জেগে, কি লোকের দাড়ি কামাবার সময়, কি সকালে কি সন্ধ্যে মনে হতে লাগলো---রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা; কিন্তু কারুর কাছে এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না---মাথা কাটা যাবে। নাপিত জাত সহজেই একটু বেশি কথা কয়, কিন্তু পাছে অন্য কথার সঙ্গে কানের কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মুখ একেবারে বন্ধ হল। কথা কইতে না পেয়ে পেট ফুলে তার প্রাণ যায় আর কি!

এমন সময় একদিন রাজা নাপিতের কাছে দাড়ি কামিয়ে সোনার কৌটো খুলে কাটা কানটি নেড়ে-চেড়ে দেখছেন, আর অমনি কোত্থেকে একটা কাক ফস করে

এসে ছোঁ মেরে রাজার হাত থেকে কানটি নিয়ে উড়ে পালালো। রাজা বললেন, 'হাঁ হাঁ হাঁ ধরো ধরো! কাক কান নিয়ে গেল!' তারপর রাজা মাথা ঘুরে সেইখানে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, প্রজাদের কাছে কী করে মুখ দেখাবো।

এদিকে নাপিত ক্ষুর ভাঁড় ফেলে দৌড়। পড়ে-তো-মরে এমন দৌড়। শহরের লোক বলতে লাগলো, 'নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া হল কী? পাগলের মত ছুটছ কেন?'

নাপিত না রাম না গঙ্গা কাকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে একেবারে অজগর বনে গিয়ে হাজির। কাকটা একটা অশ্বত্থ গাছে বসে আবার উড়ে চললো, কিন্তু নাপিত আর এক পা চলতে পারলে না, সেই গাছের তলায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো, 'এখন কী করি? রাজার কান কাটা ছিল, তখন অনেক কষ্টে সে কথা চেপে রেখেছিলুম; এখন সেই কান কাকে নিলে এ কথাও যদি আবার চাপতে হয় তাহলে আমার দফা একদম রফা! ফোলা পেট এবারে ফেঁসে যাবে! এখন করি কী?' নাপিত এই কথা ভাবছে, এমন সময় গাছ বললে, 'নাপিত ভায়া ভাবছ কী?'

নাপিত বললে, 'রাজার কথা।'

গাছ বললে, 'সে কেমন?'

তখন নাপিত চারিদিকে চেয়ে চুপি চুপি বললে---

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

এই কথা বলতেই নাপিতের ফোলা পেট একেবারে কমে আগেকার মত হয়ে গেল, বেচারা বড়ই আরাম পেলে, এক আরামের নিঃশ্বাস ফেলে মনের ফুর্তিতে রাজবাড়িতে ফিরে চললো।

নাপিত চলে গেলে বিদেশী এক ঢুলি সেই গাছের তলায় এল। এসে দেখলে গাছটা যেন আস্তে আস্তে দুলছে, তার সমস্ত পাতা থরথর করে কাঁপছে, সমস্ত ডাল মড়মড় করছে আর মাঝে মাঝে বলছে---

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

ঢুলি ভাবলে, এ তো বড় মজার গাছ! এরই কাঠ দিয়ে একটা ঢোল তৈরি করি। এই বলে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

গাছ বললে, 'ঢুলি, ঢুলি, আমায় কাটিসনে !'

আর কাটিসনে! এক, দুই, তিন কোপে একটা ডাল কেটে নিয়ে, ঢোল তৈরি করে 'রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা' বাজাতে বাজাতে ঢুলি কানকাটা শহরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কানকাটা শহরের রাজা কান হারিয়ে মলিন মুখে বসে আছেন আর নাপিতকে বলছেন, 'নাপিত ভায়া, এ কথা যেন প্রকাশ না হয় !' নাপিত বলছে, 'মহারাজ, কার মাথায় দুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে !' এমন সময় রাস্তায় ঢোল বেজে উঠলো---

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা ॥"

রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে নাপিতের চুলের মুঠি এক হাতে আর অন্য হাতে খাপ-খোলা তরোয়াল ধরে বললেন, 'তবে রে পাজি ! তুই নাকি এ কথা প্রকাশ করিস নি ? শোন্ দেখি ঢোলে কী বাজছে !' নাপিত শুনলে ঢোলে বাজছে---

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা ॥'

নাপিত কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই মহারাজ, এ কথা আমি কাউকে বলি নি, কেবল বনের ভিতর গাছকে বলেছি। তা নইলে হুজুর পেটটা ফেটে মরে যেতুম ! আর আমি মরে গেলে আপনার দাড়ি কে কামিয়ে দিত বলুন !'

রাজা বললেন, 'চল্ ব্যাটা গাছের কাছে !' বলে নাপিতকে নিয়ে রাজা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে গাছের কাছে গেলেন।

নাপিত বললে, 'গাছ, আমি তোমায় কী বলেছি ? সত্য কথা বলবে।'

গাছ বললে---

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা ॥'

রাজা বললেন, 'আর কারো কাছে নাপিত বলেছে কি ?'

গাছ বললে, 'না।'

রাজা বললেন, 'তবে ঢুলি জানলে কেমন করে ?'

গাছ বললে, 'আমার ডাল কেটে ঢুলি ঢোল করেছে তাই ঢোল বাজছে--রাজার কান কাটা। আমি তাকে অনেকবার ডাল কাটতে বারণ করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি।'

রাজা বললেন, 'গাছ, এ দোষ তোমার ; আমি তোমায় কেটে উনুনে পোড়াবো।'

গাছ বললে, 'মহারাজ, এমন কাজ কোরো না। সেই ঢুলি আমার ডাল কেটেছে, আমি তাকে শাস্তি দেবো। তুমি কাল সকালে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।'

রাজা বললেন, 'আমার কাটা কানের কথা প্রকাশ হল তার উপায় ? প্রজারা যে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে !'

গাছ বললে, 'সে ভয় নেই, আমি কাল তোমার কাটা কান জোড়া দেবো।'

শুনে রাজা খুশি হয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

রাজা ফিরে আসতেই রাজার রানী, রাজার মন্ত্রী, রাজার যত প্রজা রাজাকে ঘিরে বললে, 'রাজামশাই, তোমার কান দেখি !' রাজা দেখালেন---এক কান কাটা। তখন কেউ বললে, 'ছি ছি', কেউ বললে, 'হায় হায়', কেউ বললে, 'এমন রাজার প্রজা হবো না।' তখন রাজা বললেন, 'বাছারা, কাল আমার কাটা কান জোড়া যাবে, তোমরা এখন সেই ঢুলিকে বন্দী কর। কাল সকালে তাকে নিয়ে বনে যে অশ্বত্থ গাছ আছে তারই তলায় যেও।'

রাজার কথা শুনে প্রজারা সেই ঢুলিকে বন্দী করবার জন্যে ছুটলো।

তার পরদিন সকালে রাজা, মন্ত্রী, নাপিত, রাজ্যের যত প্রজা আর সেই ঢুলিকে নিয়ে ধুমধাম করে সেই অশ্বত্থতলায় হাজির হলেন।

রাজা বললেন, 'অশ্বত্থঠাকুর, ঢুলির বিচার করো।'

অশ্বত্থঠাকুর নাপিতকে বললেন, 'নাপিত, ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দাও।' নাপিত ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দিলে। চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, রাজার কান জোড়া লেগে গেলো। এমন সময় যে হনুমান রাজার কান ছিঁড়েছিল সে এসে বললে, 'অশ্বত্থঠাকুর, বিচার করো---রাজামশায় আমার কান কেটেছে, আমার কান চাই।'

অশ্বত্থ বললেন, 'রাজা, ঢুলির অন্য কান কেটে হনুকে দাও। এক কান কাটা থাকলে বেচারির বড় অসুবিধা হত---দেশের বাইরে দিয়ে যেতে হত। এইবার ঢুলির দু-কান কাটা হল। সে এখন দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।'

রাজা এক কোপে ঢুলির আর-এক কান কেটে হনুর কানে জুড়ে দিলেন। আবার ঢাক ঢোল বেজে উঠলো। তখন অশ্বত্থঠাকুর বললেন, 'ঢুলি, এইবার ঢোল বাজাও।'

ঢুলি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ঢোল বাজাতে লাগলো---ঢোল বাজছে---

'ঢুলির কান কাটা।

ঢুলির কান কাটা॥'

রাজা ফুল-চন্দনে অশ্বত্থঠাকুরের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরলেন। রানী রাজার কান দেখে বললেন, 'একটি কান কিন্তু কালো হল।'

রাজা বললেন, 'তা হোক, কাটা কানের চেয়ে কালো কান ভালো। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।'

বাদশা চায় পাকায়

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ির মাঝে একটি মাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ি---তা যতই কেন বাদশা আতর কস্তুরীতে দাড়ি মাজুন। ওদিকে বেগমসাহেবা---তিনিও মাথায় হীরে-মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরে মাথা ঘষা মেখেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দুজনে দুজনকে দেখে মুখ ফেরান, দুজনেই মনের দুঃখে থাকেন, শেষে এমন হ'ল যে, বাদশার দরবারে কাঁচা-দাড়ি এবং বেগমের দরবারে পাকাচুল যাদের তাদের টেকাই দায় হল।

কবি আসে, কালোয়াত আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়ীওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্টে বরং ধমক খায়, গর্দানি খায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে!

উজির ভেবেই অস্থির---কি করা যায়! নাপিত-নাপিতনীকে উজির ডেকে বলেন, 'তোরা সাঁড়াশি দিয়ে চুল-দুগাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক।'

হাজাম-হাজামিন্ দুজনে ভয়ে শিউরে উঠে বলে, 'দোহাই উজির সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না---সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা বেগমের উপর অস্তর চালাই এমন নেমকহারাম আমরা নই !'

উজির নিঃশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন! কি উপায় !

মোল্লা দো-পেঁয়াজা পেঁয়াজ-রসুন খেতে বড়ই ভালবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাষকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন মস্‌জিদে দু-বেলা; কোন ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন, 'দেখ, এই সময় বাদশা-বেগমকে খুশি করতে পার তো কিছু হতে পারে।'

মোল্লা দো-পেঁয়াজা বল্লেন, 'তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে পয়জারও হতে পারে।'

বিবি বল্লেন, 'দেখ না চেষ্টা করে। কিছু না হওয়ার চেয়ে সে-ও যে ভাল।'

মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির! দেখেন সবাই যে যার দাড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ ক'রে বসে আছেন। এমন কি যার দাড়ি-গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপরটাতেই। নাচ-গান আমোদ-আহলাদ সব বন্ধ।

বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাচ্য নেই। তখন মোল্লা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে যে ভাবে ফতোয়া দেয় লোকে, সেইভাবে সুর করে গান সুরু করলেন দাড়ি নেড়ে, যথা---

আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি,
কুল্ পাক্কা এক কাঁচ্চা
ওহি দাড়ি সব্‌সে আচ্ছা।

বাদশা খুশি হয়ে তালে তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে দো-পেঁয়াজা আবার গাইলেন---

এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো।
এক দাড়ি খালিফ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠত্তো।
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা!

শুনে-শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেল্লেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠলো পর্দার আড়ালে!

এক সঙ্গে বাদশা-বেগম আমির-ওমরা এবং শহরের কাঁচা-পাকা যে কেউ খুশি হয়ে গেল। মোল্লার আর প্যাঁজ-রসুন ধরে না ঘরে। শহরের বাড়ি বাড়ি দাড়ির গান উল্টে পাল্টে লোকে গাইতে থাকলো, যার যেমন খুশি সুরে।

(দাড়ির গান)

আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি--

কুল্ পাক্কা এক কাঁচ্চা
সব্‌সে দাড়ি ওহি আচ্ছা !

এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো,
এক দাড়ি খালিফ্ ফজিহৎ,
এক দাড়ি ঠট্‌ঢো !

সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা !

লম্বে দাড়ি ওহি আচ্ছা ।
ছোটে ছোটে ওভি আচ্ছা ।
দাড়িমে সভি সচ্চা ।

পাক্কে কাচ্চে সভি আচ্ছা ।
'আচ্ছা আচ্ছা' বোলি সাচ্চা ।

কারিগর ও বাজিকর

কারিগর যেখানে থেকে কারিগরি করে সে দেশে কাজ হয় আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে। এতটুকু বীজ যেমন হয়ে ওঠে মস্ত গাছ আস্তে আস্তে, গুটিপোকা যেমন আস্তে ধীরে হয়ে ওঠে রঙিন প্রজাপতি, সেইভাবে কাজ চলে কারিগরি-পাড়ায়। হঠাৎ কিছু হবার জো নেই সেখানে। আর বাজিকর-পাড়ায় যেখানে বাজিকর কারসাজি করে সেখানে সবই অদ্ভুত রকমের হঠাৎ হয়ে যায়। হাউইয়ের পাঁকাটি ফোঁস্ করে আকাশে উঠে ঝর-ঝর করে তারা-বৃষ্টি করে পালায়। লাল বাতি হঠাৎ সবুজ আলো দিয়ে দপ্ করে জ্বলেই নেভে—হয়ত কোথাও কিছু নেই একটা বোমা হাওয়াতে ফাটল আর রাতের আকাশ দিনের সমস্ত জানা অজানা পাখির কিচমিচিতে ভরে গেল।

কারিগরকে কেউ বড়-একটা চেনে না, কিন্তু বাজিকরের নাম ছেলে-বুড়ো রাজা-বাদশা-ফকির সবার মুখেই শোনা যায়। পয়সাও করে বাজিকর যথেষ্ট আজগুবি তামাসা দিখিয়ে।

এক সময় রাজসভায় কারিগর আর বাজিকর দুজনেরই কাজ দেখাবার হুকুম হল। যেখানে যত কারিগর যত বাজিকর সবাই যে-যার গুণপনা দেখাতে হাজির আপনার আপনার দলের সর্দারকে নিয়ে। দুই দলের মধ্যে এক মাস তের দিন লড়াই চলেছে, কোন দল জেতেও না হারেও না। ভূত-চতুর্দশীর দিন রাজা দিলেন ছুটি দুই সর্দারকে শেষ হার-জিতের জন্য প্রস্তুত হতে।

ভূত-চতুর্দশীর সারা রাত বাজিকরের ঘরে কারো ঘুম নেই। পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা লোহাচুর করতে বসে গেল, তাই নিয়ে বাজিকর অদ্ভুত সব বাজি করলে যা কেউ কখনো দেখেনি। তার উপর গাছ-চালা নল-চালা থেকে আরম্ভ করে যা কিছু বিষয় তার ছিল সব একত্র করে সে একটা মস্ত সিন্দুক ভর্তি করে ভোর না-হতে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল, সঙ্গে পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা তাল ঠুকে ডিগবাজি করে যেন সভা চমকে তুললে।

রাজা সভা করে বসে আছেন, রানীরা আড়াল থেকে উঁকি দিতে লেগেছেন। বাজি শুরু হয়, কিন্তু কারিগরের দেখা নেই।

রাজা ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'গেল কোথায় ?'

বাজিকর হেসে বলে, 'মহারাজ, সে তার একগণ্ডা চেলা নিয়ে বোধহয় রাতারাতি চম্পট দিয়েছে। অনুমতি দেন তো বাজি কাকে বলে দেখাই!'

বলেই বাজিকর একলাফে আকাশে উঠে হাওয়ার উপর তিন-চারটে পাক খেয়ে ঝুপ করে একেবারে রাজার ঠিক সিংহাসনটা বাঁচিয়ে মাটিতে সোজা এসে দাঁড়ালো। সভার চারিদিকে হাততালি আর সাধুবাদ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় বাজিকর বিদ্যের সিন্দুক খুললে। অমনি চরকি বাজির মতো বন্-বন্ করে, ছুঁচো বাজির মতো চড়-চড় করে বাজির ধুম লেগে গেল এমন যে কারু চোখে মুখে দেখবার বলবার অবসর রইল না। রাজা মহা খুশি হয়ে গজমোতির

যালা খুলে বাজিকরকে দেন---এমন সময় কারিগর এসে হাজির হল একলা।

রাজা তাকে দেখে বললেন, 'তুমি কোথায় ছিলে, এমন বাজিটা দেখতে পেলে না!'

কারিগর একটু হেসে বললে, 'এইবার তবে আমার পালা মহারাজ?'

বাজিকর তাকে ধমকে বললে, 'তোমার পালা কি রকম? এতক্ষণ এসে পৌঁছতে পারো নি, বেলা শেষ হয়েছে, যাও!'

রাজা বাজিকরকে থামিয়ে বললেন, 'না, তা হয় না। সময় আছে, এরই মধ্যে যা পারে ও দেখাক কারিগরি।'

একদিকে কারিগর আর একদিকে বাজিকর। কারিগর একটা পাখির পালক বাজিকরের হাতে দিয়ে বললে, 'এইটে ওড়াও।'

বাজিকর পালকটা নিয়ে ফুঁ দিতেই সেটা উড়ে গিয়ে সভা ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল। সভাসুদ্ধ কারিগরকে দুয়ো দিয়ে উঠল।

তখন কারিগর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, 'এইবার আমায় উড়াও তো দেখি কত বড় বাজিকর!'

সভাসুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, কী হয়! বাজিকর ফুঁ দেয়, কারিগর হেলেও না।

খানিক পরে বাজিকর চোখ রাঙিয়ে বললে, 'কই তুমিই আমায় ওড়াও তো দেখি কত বড় কারিগর !'

কারিগর একটু হেসে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই একধার থেকে একটা লোহার পাখি সভার মধ্যিখানে কারিগরের চেলারা এনে হাজির করলে।

কারিগর বাজিকরকে বললে, 'এগিয়ে এস। পাখির পিঠে চড়ে পড়, কেমন না-ওড়ো দেখি।'

কলের পাখির বিকট চেহারা দেখে বাজিকর শুকনো মুখে রাজার দিকে চাইতে রাজা বললেন, 'আচ্ছা হয়েছে, আর পরীক্ষায় কাজ নেই, ছেড়ে দাও।'

বাজিকর তখন বললে, 'সে কি মহারাজ, ও আমায় ওড়াবে কী ? লোকটা আগে নিজেই উড়ুক তো দেখি কেমন পারে ! আমি মনে করলে এখনি ওর পাখিসুদ্ধ ওকে পালকের মতো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি। শুধু ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ রেহাই দিয়েছি। আর না, দেখাচ্ছি মজা এবার !'

কারিগর হাসতে হাসতে আপনার হাতে গড়া পাখির উপর সওয়ার হল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাখি রঙিন আলোয় ডানা মেলে কারিগরকে নিয়ে মাটি ছেড়ে খুব আস্তে আস্তে আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে।

রাজা সাধুবাদ দিতে যাবেন এমন সময় বাজিকর পাখিটার পেটের তলায় দাঁড়িয়ে একটা মন্তর আউরে চারটে ফুঁ দিয়ে বললে, 'দেখুন মহারাজ। এবার একেবারে উড়ল। যাঃ ফুঁঃ ! আর আসিসনে, ভাগ্ !'

পাখি সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর ফিরল না।

রাজা বললেন, 'এ বাজিকরটা যা বললে, তাই তো করলে !'

রাজা বাজিকরকেই বকসিস দিলেন।

কারিগর খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখে সভা শূন্য। কা কস্য পরিবেদনা। শুকনো মুখে অন্ধকারে শুধু তার এক গণ্ডা চেলার মধ্যে মোটে একজন গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। বাকি চেলারা বাজিকরের কাছে বিদ্যে শিখতে চলে গেছে।

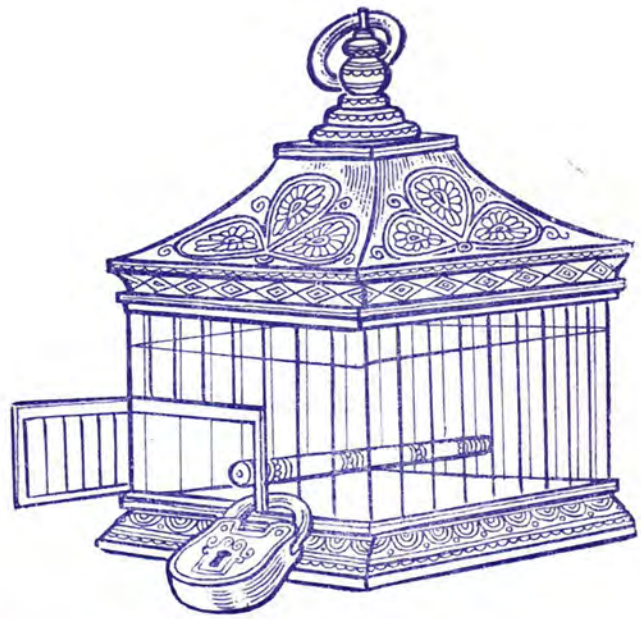

আলোয় কালোয়

পুবের পাখি তারা বাসা বেঁধে থাকে মলয় দ্বীপে চন্দন বনে। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে পুব আকাশে সোনার আলোয়। ধান-ক্ষেতের কচি সবুজ মেখে নিয়ে সবুজ হল তাদের ডানা, হিঙ্গুল ফলের কষ লেগে হল রাঙা তাদের ঠোঁট।

তার একটি পাখি একদিন ধরা পড়ল। সওদাগর তাকে জাহাজে করে নিয়ে গেল, উদয়াচল ঘুরে পশ্চিম সাগর পার হয়ে আজব সহরে। সেখানে সবুজ নেই---কেবল বাড়ি, কেবল বাড়ি! ইঁট, কাঠ, চুন, সুরকি, কলকারখানা, ধুঁয়া, ধুলো আর কুয়াসায় দিকবিদিক আকাশ বাতাস পর্যন্ত ঢাকা, দিন রাত্রি সমান অন্ধকার। আলোগুলো যেন সেখানে জ্বলছে

না। কুয়াসায় ভিজে কম্বলমুড়ি দিয়ে রাস্তার ধারে বসে সে জ্বরে কাঁপছে। সূর্যের রথ সহরের প্যাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় সহর ছেড়ে। মলয় বাতাস দুয়োরের কপাট ধরে নাড়া দিয়ে দেখে কিন্তু ঘর খোলা পায় না কোনদিন।

সবুজ পাখি সেখানে খাঁচায় রইল---কালো লোহার শক্ত খাঁচা---কলের কুলুপে চাবি-দেওয়া খাঁচা। খায় দায় পাখি, থেকে-থেকে

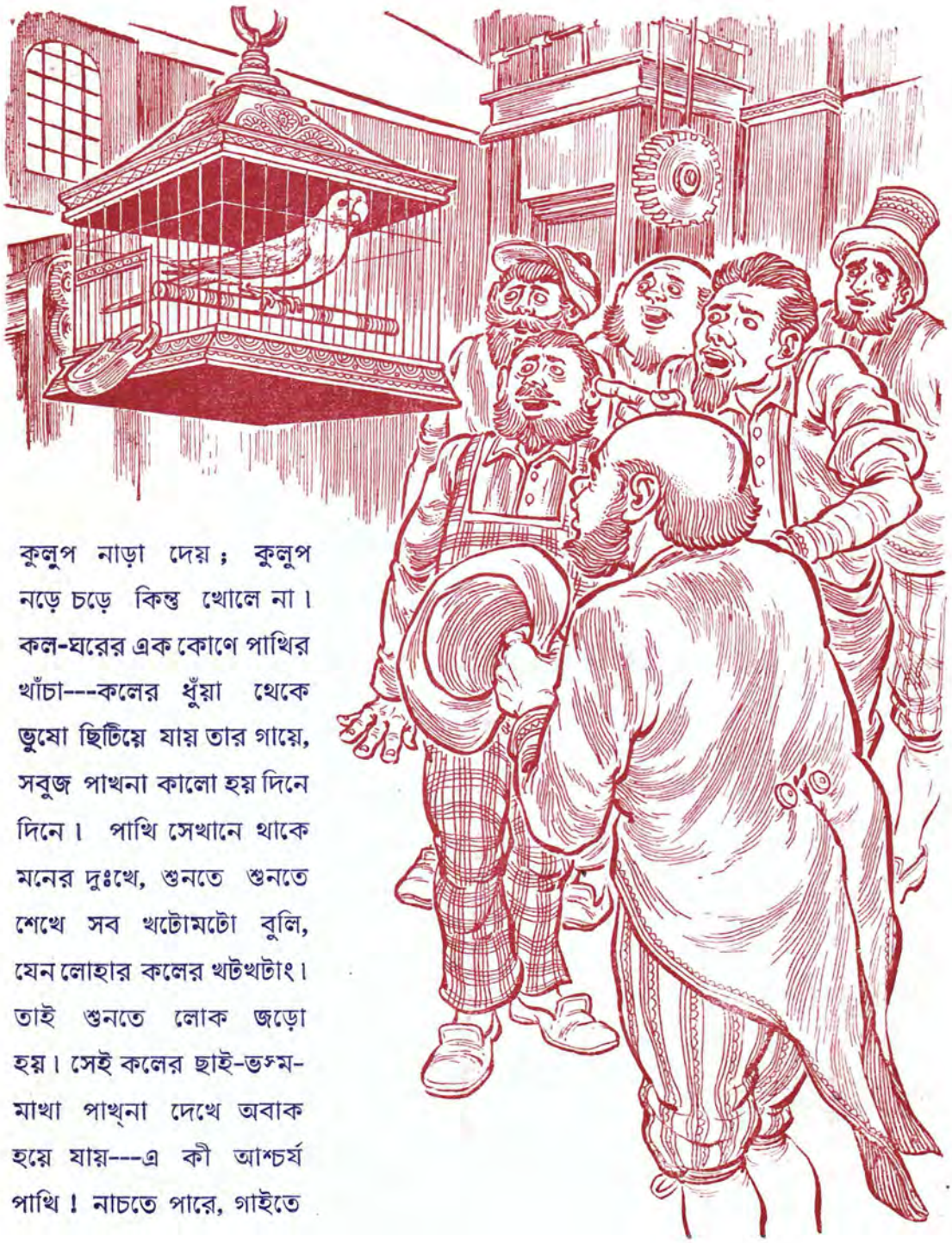

কুলুপ নাড়া দেয়; কুলুপ নড়ে চড়ে কিন্তু খোলে না। কল-ঘরের এক কোণে পাখির খাঁচা---কলের ধুঁয়া থেকে ভুষো ছিটিয়ে যায় তার গায়ে, সবুজ পাখনা কালো হয় দিনে দিনে। পাখি সেখানে থাকে মনের দুঃখে, শুনতে শুনতে শেখে সব খটোমটো বুলি, যেন লোহার কলের খটখটাং। তাই শুনতে লোক জড়ো হয়। সেই কলের ছাই-ভস্ম-মাখা পাখ্‌না দেখে অবাক হয়ে যায়---এ কী আশ্চর্য পাখি! নাচতে পারে, গাইতে

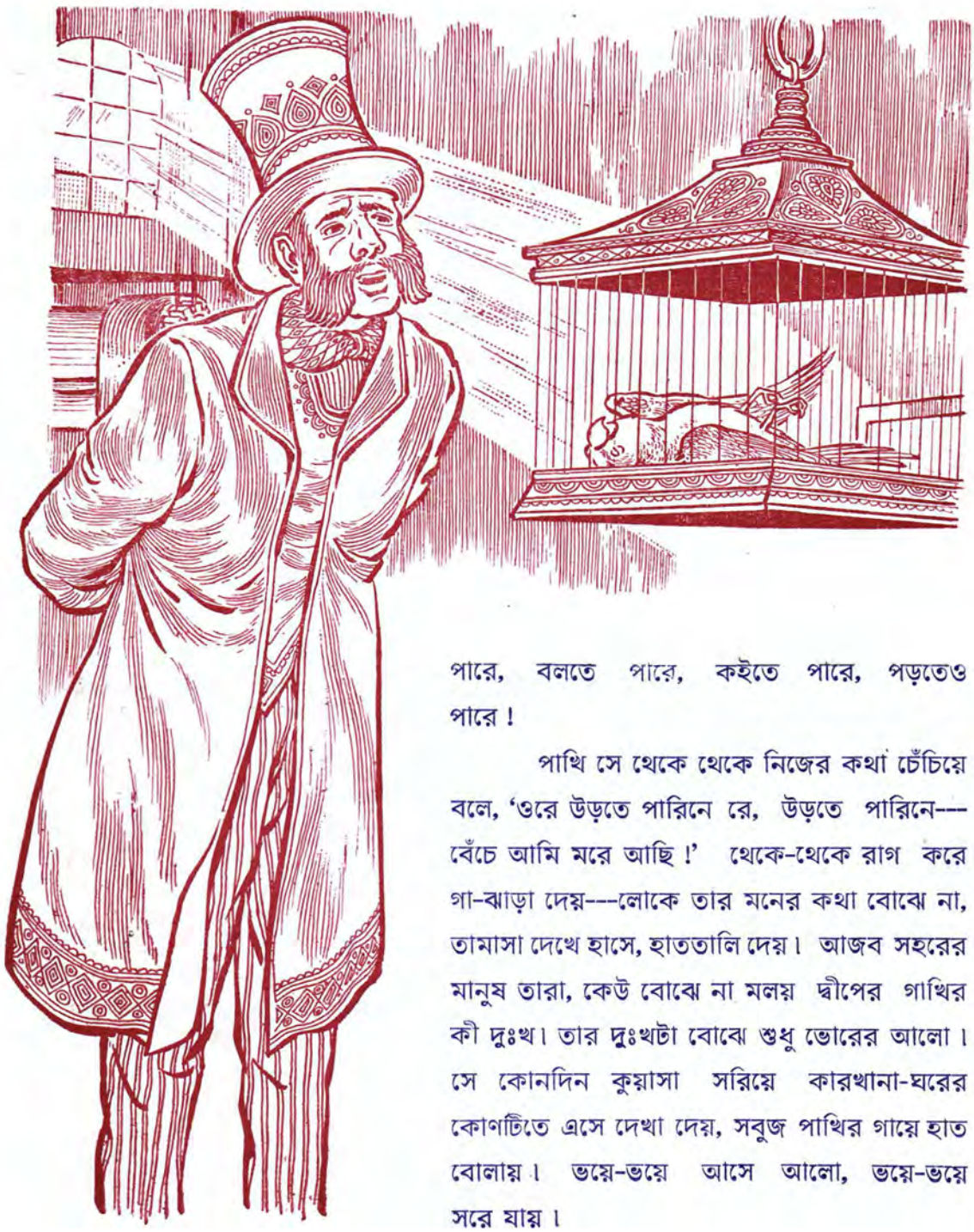

পারে, বলতে পারে, কইতে পারে, পড়তেও পারে!

পাখি সে থেকে থেকে নিজের কথা চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে উড়তে পারিনে রে, উড়তে পারিনে--- বেঁচে আমি মরে আছি!' থেকে-থেকে রাগ করে গা-ঝাড়া দেয়---লোকে তার মনের কথা বোঝে না, তামাসা দেখে হাসে, হাততালি দেয়। আজব সহরের মানুষ তারা, কেউ বোঝে না মলয় দ্বীপের গাখির কী দুঃখ। তার দুঃখটা বোঝে শুধু ভোরের আলো। সে কোনদিন কুয়াসা সরিয়ে কারখানা-ঘরের কোণটিতে এসে দেখা দেয়, সবুজ পাখির গায়ে হাত বোলায়। ভয়ে-ভয়ে আসে আলো, ভয়ে-ভয়ে সরে যায়।

পাখি বলে, 'যদি কোনদিন সিন্ধু-পারে যাও হে আলো, তবে ভুলো না, মলয় দ্বীপের সবুজ ঘরে আমার খবর পৌঁছে দিও ; বোলো আমি বেঁচে মরে আছি !'

আলো বলে, 'যেদিন আমি বড় হয়ে উঠব সেদিন নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার কথা তোমার আপনার লোকের কাছে জানিয়ে আসব।'

শীত কাটল, পরিষ্কার হল দিনে দিনে আকাশ, আলোর তেজ বেড়েই চলল। আর সে ভয়ে-ভয়ে আসে না ; অন্ধকারের ঘরে আসে রানীর মতো চারিদিক আলো করে, কারখানার কলকব্জা ঝকঝক করতে থাকে আলো পেয়ে।

পাখি আলো-মাখা ডানা কাঁপিয়ে বলে, 'আর কেন, এইবার।'

আলো বলে, 'থাকো থাকো, আজ রাতের শেষে খবর পাবে !'

খাঁচার পাখি ছট্‌ফট্‌ করে---সকাল কখন হয় তারই আশায়।

সেদিন ভোরের বেলায় কলের খাঁচায় ধরা ক্লান্ত পাখি ঘুমিয়ে গেল---সেই সময় কারখানার বাঁশি ডাক দিল কুলিদের।

পাখির কাছে আলো এসে বললে চুপি চুপি, 'মলয় দ্বীপে গিয়েছিলেম, তাদের তোমার দুঃখের খবর দিলেম !'

পাখি ঘুমন্ত চোখ একটু খুলে শুধোলো, 'তারা কী বলে পাঠালে শুনি ?'

আলো খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে বললে, 'সবাই আহা করলে, কেবল একটি পাখি সে যেমন ছিল তেমনই রইল।'

পাখির ঘাড় তুলে বললে, তারপর ?'

আলো তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, 'তারপর সে ঝরা-পাতার মতো গাছের তলায় লুটিয়ে পড়ল ধুলোতে, আর সবাই বললে, 'আহা মরে বাঁচল রে !'

খাঁচার পাখি আর কোন সাড়া দিলে না।

কল-ঘরের কল চলল বেজে---খটখটাং।

যার পাখি সে খাঁচার কাছে এসে দেখলে---পাখি মরে গেছে, আলো তার উপর পড়ে কাঁদছে।

বড় রাজার ছোট রাজার গল্প

দুই রাজা থাকেন---বড় রাজা আর ছোট রাজা। দুজনে একদিন দিক্‌বিজয় করতে চললেন। বড় রাজা চললেন বড় বড় হাতী ঘোড়া কামান বন্দুক সাজিয়ে মস্ত মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে, বড় বড় রাজত্ব জয় করতে করতে। এদিকে ছোট রাজা, তিনি চললেন ছোটলোকের সাজে, ছোট ছোট খেলবার কামান বন্দুক হাতী ঘোড়া নিয়ে ছোট একটি পুটলি বেঁধে ছোট রাজত্ব জয় করতে---বড় রাজার পিছনে পিছনে।

মস্ত বড় এই পৃথিবী---বড় রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন---এমন সময় চর এসে খবর দিলে, মহারাজ, শুনে এলুম, ছোট রাজা ছোট রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছে।

বড় রাজা বললেন, তাকে বল, আমি পৃথিবীটা জয় ক'রে নিয়েছি, সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক।

দূত গেল ছোট রাজার কাছে। কিন্তু ছোট রাজার সে রাজ্য এত ছোট যে দূত

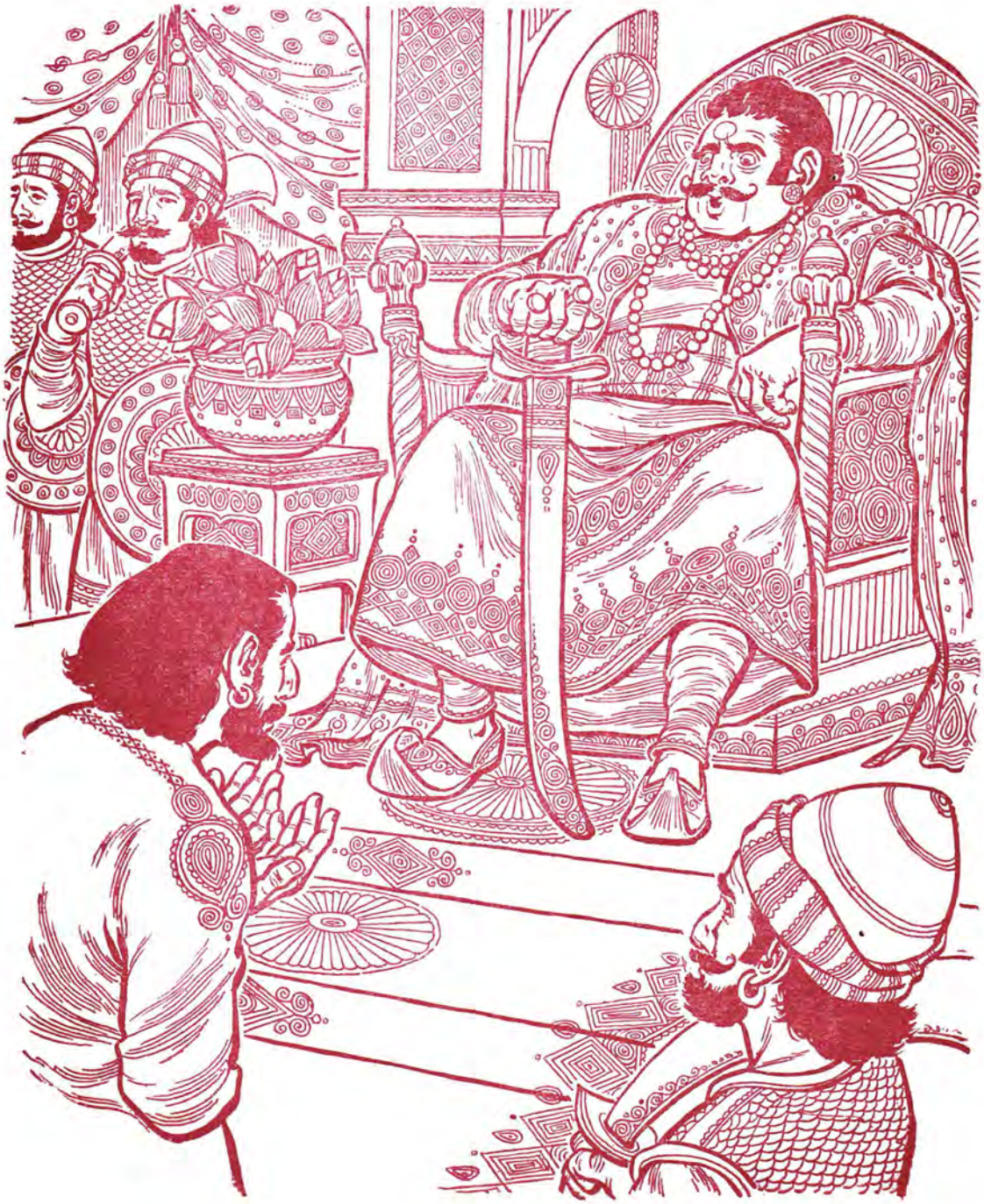

দেখতেই পেল না কোথায় বা রাজা, কোথায় বা রাজত্ব! সে ফিরে এসে বড় রাজাকে খবর দিলে ---চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব; সেখানে প্রবেশ করা ভারী কঠিন!

বড় রাজা বড়ই খাপ্পা হ'য়ে বললেন, চলো, আমি নিজে যাবো।

বড় রাজা মস্ত মস্ত হাতী ঘোড়া রথ রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোট সহর এত ছোট যে, সেখানে হাতী চলে না, ঘোড়া চলে না।

মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিলে, সবাই চোখে অনুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো।

সেনাপতি বললেন, এতে কোরে চোখ চল্‌বে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।

রাজা বললেন, দেখাই যাক না।

যুদ্ধ বাধলো---সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোট রাজার ফৌজ গলে পালালো। তীর কামান আন্দাজ ঠিক করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকলো, নয়তো আকাশে ঘুরে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ বড় রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগলো। বড় বড় অস্তর---সে সব বড় জিনিসকেই লক্ষ্য করে, ছোটকে দেখতে পায় না।

বড় রাজা, বড় বড় মন্ত্রী, বড় বড় সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন।

ছোট রাজা হেসে বললেন, দাদা, তুমি তোমার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাক। ছোটতে-বড়তে সন্ধি হ'লে কি হয় তা জান না কি ?

বড় রাজা বললেন, তা কি আর জানিনে ?

মন্ত্রীরা বললেন, তা কি আর জানেন না ?

সেনাপতি বললেন, এত বড় পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড় রাজা, এটুকু আর জানেন না?

ছোট রাজা বললেন, তা হ'লে এবারকার মতো এইটুকু জেনেই ঘরে যান সকলে। আরো কি জানতে চান?

বড় রাজা বড় রেগে বললেন, ছোটকে টুঁটি চেপে ধরলে সে কি করে তাই জানতে চাই।

বলেই বড় রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় ছোট রাজা, মায় তাঁর রাজত্বটা পর্যন্ত কষে চেপে ধরলেন। জল যেমন গলে পালায় তেমনি বড় রাজার মোটা-মোটা আঙুলের ফাঁক বেয়ে ছোট রাজা, মায় তাঁর রাজ সিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল।

বড় রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি; বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কি বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড় রাজার আঙুলটা ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে।

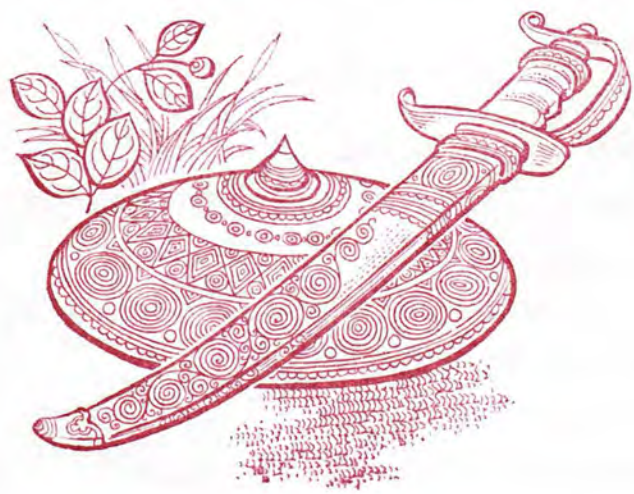

টুকুরি বুড়ি

জন্মেই শুরু করলে ছেলেটি কান্না---উঁ-আঁ-ঙ-ঙ-ঙ, সে কান্না আর থামে না।

'ও ছেলের মা, দুধ দাও গো ভুখ লেগেছে, ছেলে যে গেল!' দুধ টেনে খায় ছাওয়াল চোঁ-চোঁ, পেট ভরে, তারপর আবার শুরু ঙ-ঙ। মা বলে, 'বুকে যে দুধ নেই বাবা, আর কি খাবা? বলি গাই-দুধ কোথা পাব, বাঘের দুধ আনি খাওয়াব? ও ছাগলির মা, যা তো বনে, দেখ তো বাঘিনী বিয়াল ক'নে!'

মা ছড়া কাটে, ছেলে তো ভালো না। ঙ-ঙ কেঁদেই চলে, ভুলে না। এ পহর ও পহর কাঁদছে তো কাঁদছেই।

ছেলের কান্নায় পাড়ার লোক অস্থির।---'বলি ও ছেলের মা, তোমার ছেলেকে হয় দানায় পেয়েছে, না তো কিছু রোগে ধরেছে বাপু! নজ্জুম ডাকাও, হকিম আনাও, ঝাড়-ফোঁক করুক, দাবাই পেলাক, ছেলে ঘুমাক, পাড়া জুড়াক।'

নজ্জুম ডাকাতে হকিম আনাতে হাতের খাড়ু বিকিয়ে যায়। হকিমের হিকমত হয় না, কাঁদুনি থামা দেয় না ছেলে।

নজ্জুম খড়ি পেতে গণনা করে বলে, 'ও ছেলের মা, চিন্তা কোরো না।

লিখছে উমর এঁর করহ খেয়াল
হাজার উপরে আরো চারিশত সাল
তার মধ্যে নয়শত পঞ্চাশ বছর
লইবেন ইনি সংসারের খবর।
---তিনশত পঞ্চাশ সাল তুফান বাদেতে
রহিবেন জেন্দা জাঁহানে হায়াতে---

সে তুফানে কেউ বাঁচবে না গো, কেউ বাঁচবে না, কেবল ইনিই তখন ভেসে যাবেন।'

নজ্জুমের কথা শুনে ওদিকে ছেলের মা কাঁদে, 'কি হবে গো---ওমা!'

নজ্জুম বোঝায়, 'ভাবনার কারণ নেই। তুফানের আসার এখনো বহুত দেরি দেখছি!'

পাড়াপড়শিরা কাঁদে, বলে, 'ততদিন এ ছেলের কান্না সইতে হবে---ওমা গো, কি করি!'

ঙ-ঙ বলতে বলতে ছেলের বুলি ফুটল।

মা বলে, 'বাবা, বড় হলে, তবু এখনও কাঁদ কেন অমন করে? পাড়ার লোক যে রাগ করে!'

ছেলে বলে, 'কাঁদি কি সাধে! পাড়াপড়শির জন্যেই তো কাঁদি! এরা যে বুঝছে না---গজব পড়ল বলে, তুফান এল বলে! এইবেলা সাবধান হওয়া চাই, সময় থাকতে উপায় ঠাওরাবে রক্ষের, তা না হেসে খেলে বেড়াচ্ছে নির্ভাবনায় সবাই!'

'ওমা, ওগো ও পড়শিরা, ছেলে বলে কি শোন।'

'ও ছেলের মা, তুই শোন। তুফানের কথা শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। এখন ভাল চাও তো ছেলেকে---কি আর বলি! হকিমও হয়েছে যেমন নজ্জুমও হয়েছে তেমন। তুফানের ভয় ঢুকিয়ে গেছে, ছেলে এখন তুফানই তুলছে, আর থেকে থেকে চিল্লিয়ে পাড়া মাত করছে।'

ছেলে বড় হয়। এখন আর কাঁদে না---ক্রন্দন করে। আরো বড় হয়ে তখন বিলাপ করে।

পড়শিরা বলে, 'ও ছেলের মা, ছেলের মা, আর দেখ কি, এইবার

প্রলাপ শুরু হলেই হল। দিন থাকতে ছেলের বিয়েটি দিয়ে ওকে বউয়ের জিম্মে করে তুমি ভেক নিয়ে বেরিয়ে পড়---না হলে ভোগান্তি আছে কপালে !'

তা করল কি ? জুটিয়ে দিলে ছিঁচকাঁদুনি একটা মেয়ে পাড়ার পাঁচজনে, হয়ে গেল বিয়ে। ছেলের মা একচোখে হাসে, একচোখে কাঁদে আর বলে, 'বউ তুমি রইলে, পাড়ার পাঁচজনা তোমরা রইলে, আমি চললুম টুকরি হাতে পাড়া ছেড়ে।

আমার ঘরও রইল দুয়ারও রইল
আমি চললেম খালি
হয়ে বরাহনগর কাশীপুর
হাবড়া শালকে বালি।'

বুড়ি ভেখ নিয়ে বেরোতে চায়, কচি বউ কাঁদে ও-ও, মনে পড়ে যায় কোলের ছেলের কান্না, যাওয়া হয় না ভেক নিয়ে বেরিয়ে।

'বলি ও ছেলের মা, বসে আছ যে, যাচ্ছ কবে শুনি!

'আর যাওয়া! যে বউ করে দিয়েছ তোমরা, দুয়ারের চৌকাট পাড়াতে গেলেই কান্না ধরে।'

'আহা কাঁদুক গো কাঁদুক, কাঁদবে না, বল কি! কচি মেয়ে পরের ঘর করতে এসেছে---'

'তাই তো ভাবি গো, পড়শিরা, কোন্ চুলোয় যাব আর! বসে থাকি ঘরে বউ আগলে।'

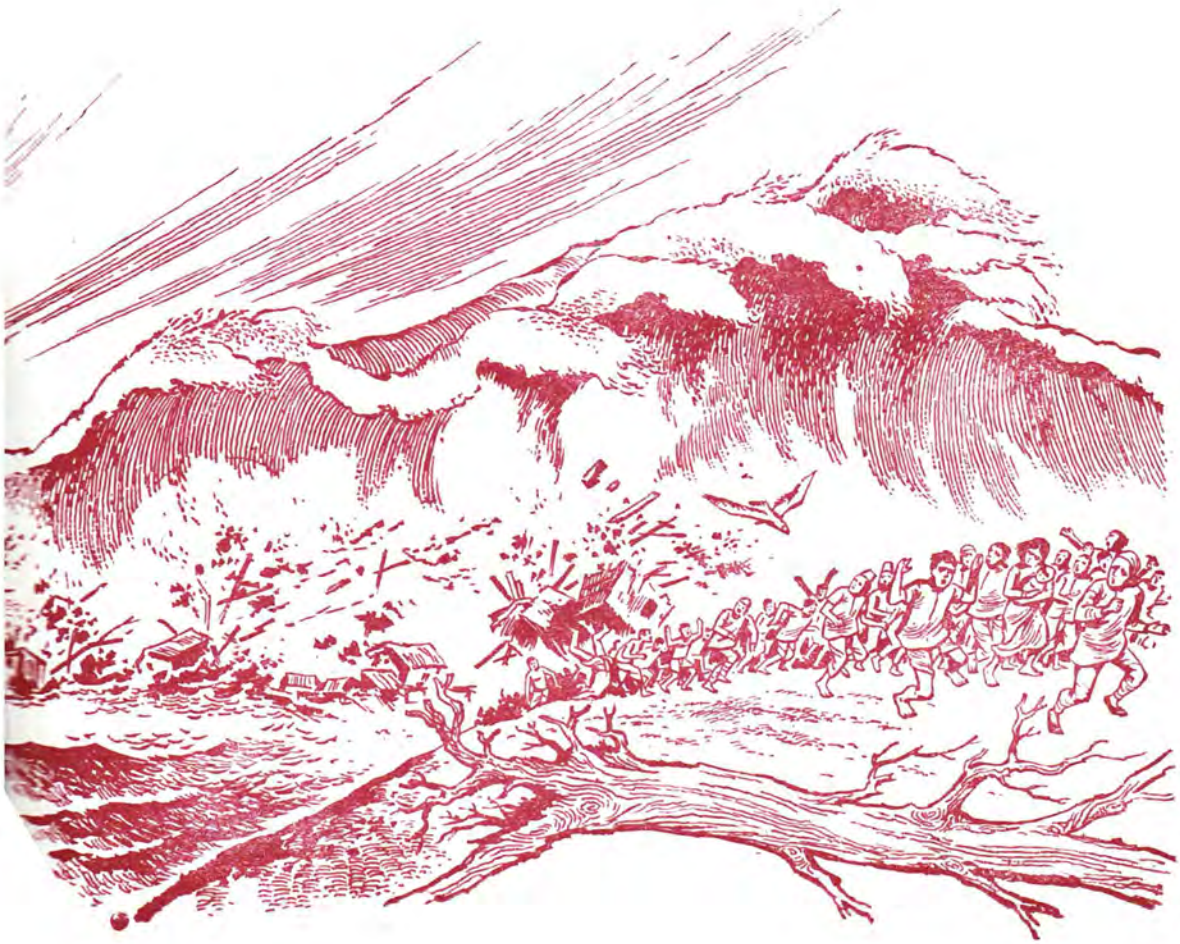

'তোমার বেটা কি করছেন আজকাল ?'

'সে গেছে ঐ জঙ্গলে কর্পূর গাছ কেটে আনতে।'

'কেন গো, কর্পূর কাঠের খোঁটা দিয়ে ঘর তুলবে, না তক্তা চেলে সিন্দুক গড়বে ?'

'কি জানি ভাই, শুধোলে বলে কর্পূর কাঠে একটা কিস্তি বানাবে। তুফান যেদিন আসবে, সেদিন জরু গরু সবাইকে নিয়ে ভেসে পড়বে, গ্রামখানা ডোবার আগে।'

'তুফান রোগ এখনো ছাড়েনি তাহলে ! বল তোমার ছেলেকে ডাঙায় কিস্তি চালাবার মতলব ছাড়ুক। এখন থেকে ঐ পাহাড়ের চুঁটিতে একখানা বড় দেখে ঘর বাঁধুক---তুফান এলে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে উঠব।'

'তাই বলে দেখব, যদি রাজি হয় !'

'যাই বল ছেলের মা, ঐ তুফানেই দেখবে শেষে তলাবে তোমরা সবাই !'

'তুফানের তো এখনো দেরি আছে---দেখি এর মধ্যে যদি ছেলের সুবুদ্ধি জোগায়।'

'জোগাবে গো জোগাবে, সময় কালে জোগাবে, যেমন জুগিয়ে থাকে অনেকেরই।'

'যদি না জোগায় ভাই---তবে উপায় কি ?'

'নিরুপায়ে উপায় রুপায়---রূপোর তাবিজটা বাঁধা দিয়ে নোয়ার বালা একটা কষে দাও ছেলের হাতে,---দেখবে কিস্তিমাতের বেলায় ফল পাবে।'

'আমাদের তেনারই মত।'

এমনি তেনার মত করতে করতে তাবিজ, পঁইচি, হাঁসুলি, মাদুলি সব গেল ছিঁচকাঁদুনি বউটার। রইল ঘরের চারখানা ফুটো চাল, মেঝের ছেঁড়া মাদুর আর হেঁসেলের চুলোটা হাঁ করে---তার মধ্যে বেঁধেছে উইচিংড়িকটা বাসা। উঠানের কোণে মশলা বাটা শিল বুকে নোড়া চাপিয়ে, আর কুয়োতলায় ফুটো ঘটটি গলায় ফাঁসি দেবার দড়ি আগলে।

সেইকালে অকাল পড়ল দেশে, আকাশ ছিল নীল, হয়ে উঠল ঘোর কালো। শুকতারা সন্ধ্যাতারা মিটি-মিটি করে যেন নিভতে চায় বাতাসে। হাওয়া সুর ফেরায়, ফুল ফোটানোর দিন আর আসে না। ঝড়ে কাত হয়ে পড়ে ফুলের গাছ, মচকে যায় ফুলের ডাল। ছচিমচি হয়ে যায় সারা মালঞ্চ।

রাতের আকাশে চাঁদ উঠে না, বিদ্যুৎ খেলে। দিনের আকাশে পড়ে থেকে থেকে বাজ। শুকনো কুয়ো ঘিরে ব্যাঙগুলো ডাকে গজব বড়---গড় বড়---জড় নাই---জড় নাই। মুশকিল আসান, মুশকিল আসান রব তোলে পাড়া। সুরে ডাকে দিনে দুপুরে শ্যালগুলো।

সেইকালে কি হল---বুড়িকে ডাক দিলে স্বপনে এসে তার ছেলে, 'চলে এস, চলে এস।'

শুনল সে কানেকালা বুড়ি, ছানিপড়া দুচোখ মেলে দেখলে স্পষ্ট---কর্পূর কাঠের নৌকো বেয়ে আসছে তার ছেলে, প্রচণ্ড তুফানের উপর দিয়ে আসছে কিস্তি, সাদা পাল তুলে, দুধের ফেনা কেটে কেটে দুলতে দুলতে---

দুলতে দুলতে বান এসেছে
জলে কত চাঁদ ভেসেছে।

এই দেখতে দেখতে রাতের ঘোর কেটে যেতেই বুড়ি পেলে কর্পূর-বাস হাওয়ার পরশ, শুনলে একটি কথা, 'মা'!

শরীর বুড়ির শীতল হয়ে গেল---মন ঠাণ্ডা হল।

আরামের নিশ্বাস ফেলে বুড়ি বললে, 'এলি বাপ আমার!'

শেষ হল বুড়ির দুঃখ ভাবনা ভয় সব। ভেসে গেল সেইকালে টুকরি গ্রাম---বানে।

ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা

সিংহির মামা ভোম্বলদাস নেহাৎ সেকালের জানোয়ার ; রাজকার্য চালাবার মতো বুদ্ধিও তাঁর ছিলনা, গায়ের জোর যে খুব ছিল, তাও নয় ; খোস-মেজাজে সেজে-গুজে সিংহাসনে বসে আয়েস আর আমোদ-আহলাদ করতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। রাজকার্য করবার নাম শুনলে তাঁর জ্বর আসত,---লড়াই করা তো দূরের কথা। কিন্তু দেশ-বিদেশের সবাই তাঁকে মস্ত রাজা বলে জানত। সবাই বলত---'সিংহির মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ !'

যে ভোম্বলদাস ঘরের কোণে আরসোলা উড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়, সে কেমন কোরে দশ গণ্ডা বাঘ মারলো ? ভোম্বলদাসের একটি মস্ত গুণ ছিল ; সেটি হচ্ছে মন্ত্রী বেছে নেবার ! দেখে দেখে তিনি শেয়ালপণ্ডিতকে আপনার প্রধানমন্ত্রী কোরে নিয়েছিলেন ; আর তাঁরই পরামর্শে দশ গণ্ডার চেয়েও ঢের বেশী বাঘ মেরে তিনি পশুদের মধ্যে একচ্ছত্র রাজা হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।

কিন্তু কপাল। বনের যত জোরোয়ার জানোয়ার দেশের চারিদিকে সুখ-শান্তি দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলো। তারা কোথাও একটা লড়াই বাধিয়ে খানিক হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি মাথা ফাটাফাটি করতে ভোম্বলদাসকে ধরে পড়লো।

ভোম্বলদাস শেয়ালের সঙ্গে যুক্তি করে বললেন, 'আমার শত্রু যারা ছিল সব তো যমের বাড়ী পাঠিয়েছি ; লড়াই হবে কার সঙ্গে ?'

দুষ্টু জানোয়ার, তারা আগে হতেই সড় করে এসেছিল ; তারা পিঁপড়েদের ক্ষুদে শহরের উপর চড়াও হয়ে লড়াই দেবার জন্যে অনুরোধ করলে।

শেয়ালপণ্ডিত বললেন, 'এমন কাজ করো না! তারা দেখতে ছোট কিন্তু কামড়ালে আর রক্ষে নেই।'

সবাই হেসে শেয়ালের কথা উড়িয়ে দিলে। লড়াই বাধলো। জীবনের মধ্যে ভোম্বলদাস এই এক ভুল করলেন,---বুদ্ধিমানের কথা ঠেলে, গায়ের জোরের মান রাখতে গেলেন। তার ফলও ফলতে দেরী হলো না! লড়াই তো যেমন হবার হলো, কিন্তু ক্ষুদে শহরের একটি ইঁটও খসাতে পারলে না। উল্টে সিংহির মামা ভোম্বলদাস বুড়ো বয়সে হাতে-মুখে, নাকে-চোখে, কানে-ল্যাজে, বুকে-পিঠে, পেটে এমন কামড় খেলেন যে সর্বাঙ্গ ফুলে ঢোল! না পারেন চলতে, না পারেন বলতে। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কাজে মন দিতে গেলে মাথা ঘোরে ; জানোয়ারদের মুল্লুকে রাজ কার্য অচল হলো। শেয়ালপণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। বাঘা-কোটাল, ভালুক-মন্ত্রী এমনি সব রাজ্যের বড় বড় আমির-ওমরা গো-বদ্যিকে ডেকে রাজার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু ঘুঁটে-ভস্ম, গোবর-প্রলেপ এসবে কিছুই হলো না। তখন বকা-ধার্মিক এসে ভোম্বলদাস মহারাজকে কৈলাস করবার ব্যবস্থা দিলেন। মহারাজও ভাগ্নে সিংহকে রাজ্যের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কৈলাসের দিকে রওনা হতে প্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমি তো চলৎ-শক্তি-রহিত, আমাকে কেউ যদি রেখে আসে তো কৈলাস যাওয়া ঘটে---নচেৎ উপায় নাস্তি !'

বকা-ধার্মিককে রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হলো। কিন্তু কৈলাসে দুরন্ত শীত, তার উপর সেখানে মাছ খাওয়া নিষেধ, কাজেই বকা পিছলেন। তিনি গেলে পশুদের ধর্ম কথা শোনায় কে ? বাঘা-কোটালেরও ঐ একই কথা। তিনি না থাকলে গৃহস্থের গরু-জরু সামলায় কে ? ভালুক-মন্ত্রী যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন রাজা সিংহকে নিয়ে রাজকার্য

চালাবার জন্যে সদরে থাকা তাঁর বিশেষ দরকার। কাজেই তাঁরও যাওয়া হয় না। শেয়াল-পণ্ডিতকে রাজা বললেন, 'পণ্ডিত, তুমি কি বল ?'

পণ্ডিত কি জানি কি ভেবে বললেন, 'জানোয়ারদের দেশে গায়ের জোরের চর্চাই দেখছি বেশী, বুদ্ধির চাষ কম, সুতরাং এ-রাজ্য থেকে আমি চলে গেলে কোন কাজই আটকাবে না। গর্দভ রইলেন পাঠশালাগুলোর তদারক করতে। আমি মহারাজকে সশরীরে কৈলাসে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রাজা খুশী হয়ে শেয়ালকে কৈলাস-যাত্রার আয়োজন করতে তখনি হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

কৈলাসে শীত বিষম, কাজেই রাজ্যের ভেড়া মেরে শেয়াল তাদের ছাল সংগ্রহ করতে লাগলেন ; আর পথে খাবার জন্যে ভেড়ার মাংস, ছাগলের মাথাগুলোও বোঝা বাঁধা হলো। এ ছাড়া নানা সুস্বাদু পাখি, খরগোস, এমন কি রাজার জন্যে কচি কচি বাঘ-ভাল্লুকের গা থেকে ছাল পর্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হলো। বকের পালকের বালিশ, লেপ, তোশক, গণ্ডারের ছালের প্যাঁটরা আর জুতো, মোষের শিঙের ছড়ি, গজদন্তের খড়ম---এমনি নানা সামগ্রী শেয়ালের কাছে দিনে দিনে স্তূপাকার হয়ে উঠলো।

এদিকে জানোয়ারদের ঘরে ঘরে কান্না উঠেছে, কিন্তু রাজার প্রয়োজনে এই সব সংগ্রহ করছেন শেয়াল পণ্ডিত---কারো কথাটি বলবার সাধ্য নেই! ভাল্লুক-মন্ত্রী বকা-ধার্মিককে বলে কয়ে যাতে রাজার চটপট যাওয়া হয়, এমন একটা ভালো দিন পাঁজি-পুঁথি দেখে স্থির করতে বলে দিলেন। সামনে অশ্লেষা-মঘা, সেই দিনই উত্তম বলে ঠিক হলো। প্রজারা সবাই রাজাকে বিদায় দিতে এলো। রাজার কৈলাস যাত্রার সাজ-সরঞ্জাম জুগিয়ে প্রজারা কেউ নুন-ছালের জ্বালায়, কেউ দাঁতের বেদনায়, কেউ বা ছেঁড়া-পালকের শোকে চোখ-মুখ ফুলিয়ে এসেছে দেখে, শেয়াল রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রজারা তাঁরই বিরহে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করছে। ভোম্বলদাস খুশী হয়ে সবাইকে আশীর্বাদ করে রওনা হলেন। পিছনে শেয়াল তার দলবল, রাজ্যের যা কিছু ধন-দৌলত, আসবাব-পত্র নিয়ে রাজার সঙ্গে কৈলাস করতে চললো।

এদিকে গ্রামে-গ্রামে ঘাটিতে-ঘাটিতে খবর এসেছে ভোম্বলদাস কৈলাস চলেছেন। সবাই রাজা দেখতে পথের দুই ধারে ভিড় লাগিয়েছে। ভোম্বলদাস রয়েছেন রাম-ছাগলের চামড়ার কম্বলে ঢাকা ডুলির মধ্যে। আর শেয়াল চলেছেন আগে আগে বুক ফুলিয়ে।

পাড়াগেঁয়ে জানোয়ার তারা কোনোদিন রাজাকে চোখে দেখে নি। শেয়ালকেই রাজা ভেবে তারা দু'হাতে সেলাম দিতে লাগলো ; সঙ্গের ডুলিতে কম্বল মুড়ি দেওয়া ভোম্বলদাসকে দেখে তারা ভাবলে রানী।

সুন্দরবনের সিংহগড় থেকে শেয়ালপণ্ডিতের বাড়ী জম্বুকগড় হলো তিন হপ্তার পথ ; আর কৈলাস তিন মাসেরও বেশী রাস্তা। বুড়ো ভোম্বলদাসের সঙ্গে দেশ ছেড়ে এতটা যাওয়া শেয়ালের আদপেই ইচ্ছা ছিল না। সে যত শীঘ্র পরে বুড়ো রাজার সঙ্গে তাঁর ধন-দৌলত নিজের ঘরে এনে ফেলবার মতলবে আছে।

এদিকে কিন্তু ডুলির মধ্যে ঝাঁকানি খেতে খেতে রাজার প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা ঘাটিতে ঘাটিতে জিরিয়ে

যাওয়া। যেখানে ভালো গ্রাম দেখেন সেইখানেই রাজা বলেন, 'ওহে পণ্ডিত, জায়গাটা তো ভালো বোধ হচ্ছে। দু-এক দিন এখানে থেকে গেলে হয় না ?'

শেয়াল অমনি বলে ওঠে, 'না মহারাজ, এখানে থাকা চলবে না, এটা হলো মশা ভন্‌ভনানির দেশ! রাত্রে নিদ্রা মোটেই হবে না---এগিয়ে চলুন!'

আরো কতদূর গিয়ে রাজা বলেন, 'ওহে, এ স্থানটা কেমন ?'

'মহারাজ, এটা, হাড়মড়মড়ি শহর! এক ঘন্টা এখানে কাটালেই বাতে ধরবে।'

'ওহে পণ্ডিত, এ জায়গাটা ?'

'সর্বনাশ! এটা পিপঁড়ে-কাঁদা গ্রাম! এখানে থাকা হতেই পারে না---না খেয়ে প্রাণ যাবে!'

এই ভাবে রাজাকে কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে, শেয়াল দিন-রাত চলে এক হপ্তায় তিন হপ্তার পথ নিজের আড্ডায় এসে হাজির। কিন্তু শেয়ালের গর্তে তো সিংহের মামা প্রবেশ করতে পারেন না, কাজেই বাইরে গাছতলায় তাঁকে শোয়ানো হলো। ধন-দৌলত সমস্তই শেয়ালের গর্তে গিয়ে পৌঁছলো।

রাজা ডুলি থেকে কষ্টে মাটিতে নেমে বলেন, 'ওহে পণ্ডিত, কৈলাস আর কতদূর ?'

'কাছে মহারাজ! ঐ যে কৈলাসের চূড়ো দেখা যায়!'

রাজাকে কিছু দূরে একটা উই-ঢিপি দেখিয়ে দিলেন।

রাজা খুশী হয়ে বললেন, 'তাহলে এই গাছতলায় দিন কতক আরাম করা যাক! একটু সুস্থ হয়ে পাহাড়ে ওঠা যাবে।'

শেয়াল বললে, 'মহারাজ, এইখানে বসে কিছু দিন তপস্যা করেন! পশুপতির কৃপায় দু-দিনেই রোগের শান্তি হবে!'

এই বলে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে শেয়াল নিজের গর্তে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

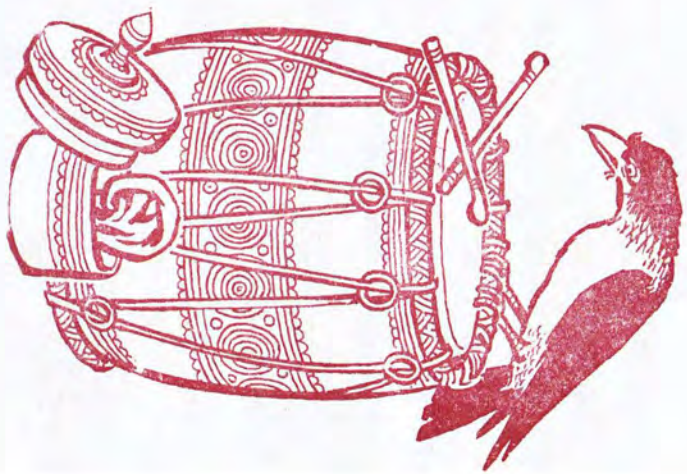

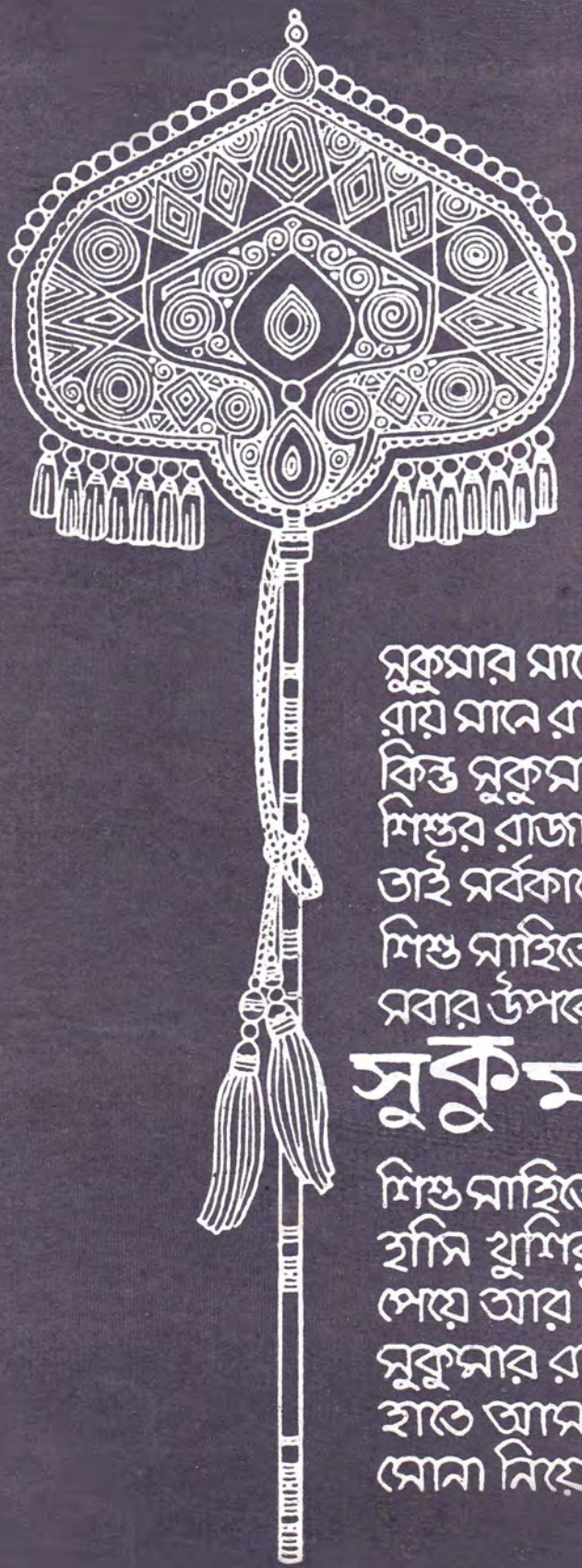

সুকুমার মানে নির্মল শিশু আর
রায় মানে রাজা
কিন্তু সুকুমার রায় শুধু
শিশুর রাজা নন, শিশু সাহিত্যেরও
তাই সর্বকালে সর্বযুগে
শিশু সাহিত্যের তালিকার
সবার উপরে

সুকুমার রায়

শিশু সাহিত্যের রাজা সুকুমার রায়ের
হাসি খুশির বই
পেয়ে আর দিয়ে সমান মজা
সুকুমার রায়ের বই
হাতে আসা মানে এক জাহাজ
সোনা নিয়ে ঘরে ফেরা